



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 394 - 403

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

‘কঙ্কাবতী’র পথরেখায় বাংলা অভিযান কাহিনির মেয়েরা

ড. শ্রীময়ী ব্যানার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহাবিদ্যালয়

Email ID: sreemoyee18@gmail.com

 0009-0002-0352-5235

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Adventure,
Narrative,
Girls,
Nineteenth
Century,
Twentieth
Century,
Family,
Freedom.

Abstract

One of the most popular branches of Bengali children’s and young adult literature is adventure stories. These narratives fall outside the conventional frameworks of children’s fiction. The moral standards that typically regulate writing for young readers are often violated in works of this kind. Bengali adventure stories show a predominance of adolescent male groups. As in other branches of children’s and young adult literature, girls are more or less marginalized here as well. In this article, we will primarily seek to explore the reasons behind such a position or role of girls in adventure narratives. In the second part of the article, we will focus on Trailokyanath Mukhopadhyay’s novel ‘Kankabati’ and attempt an alternative reading of it.

In the first half of the essay, our main topics of discussion are —

1. Definition and analysis of the nature of adventure narratives
2. Characteristics of Western adventure narratives
3. The distinctiveness of adventure narratives written in the East, particularly in the Bengali language
4. Colonial consciousness and adventure narratives
5. Notions of family in the nineteenth and twentieth centuries
6. The position of women in the social and cultural spheres in the nineteenth and twentieth centuries
7. The position of girls in adventure narratives

The central focus of the second section of the article is an attempt at a parallel reading of the conventional interpretation of Trailokyanath Mukhopadhyay’s novel ‘Kankabati’. In this context, the novel will be analyzed from Kankabati’s perspective. How the earnest aspirations of nineteenth-century women developed within Kankabati’s dream world will be presented through appropriate explanation. It will be established as a substantiated fact that Kankabati was the first to bring girls to the forefront in Bengali adventure narratives. The article will thus attempt to demonstrate that the novel ‘Kankabati’ stands as a pathfinder for girls’ adventures in Bengali literature.

Discussion

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা অভিযান কাহিনি বা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী কাহিনি। এই কাহিনিগুলি শিশু-কিশোর পাঠ্য কাহিনির প্রচলিত ছকের বাইরের লেখা। নৈতিকতার যে মানদণ্ড ছোটদের রচনার নিয়ন্ত্রক, সেই বিষয়গুলি অনেকক্ষেত্রেই লজ্জিত হয়ে থাকে এ জাতীয় রচনায়। বাংলা অভিযান কাহিনিতে কিশোরবাহিনির আধিক্য। শিশু কিশোর সাহিত্যের অপরাপর শাখার মত এখানেও মেয়েরা একপ্রকার ব্রাত্য। উক্ত প্রবন্ধে আমরা প্রাথমিকভাবে সন্ধান করব, অভিযান কাহিনিতে মেয়েদের অবস্থান বা ভূমিকা এইরকম হওয়ার কারণ। প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে আমরা আলোকপাত করব ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসে, থাকবে তার বিকল্প পাঠ প্রচেষ্টা।

প্রথমেই আমরা দেখে নেব, ‘অ্যাডভেঞ্চার’ বলতে কী বোঝানো হয়। Collins Cobuild ‘Essential English Dictionary’-তে ‘Adventure’ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে—

“An adventure is a series of events that you become involved in that are unusual, exciting and rather dangerous.”^১

সুতরাং, বাঁধা গতির বাইরে নতুন ধরনের উদ্দীপনামূলক কোনো কাজে বাঁপিয়ে পড়াই হল অ্যাডভেঞ্চার। এই কাজ কখনো কখনো বিপজ্জনকও বটে। ‘Encyclopedia of Adventure Fiction’ – এর ভূমিকায় সমালোচক Don D'Amassa বলছেন –

“An adventure is an event or series of events that happens outside the course of the protagonist's ordinary life, usually accompanied by danger, often by physical action. Adventure stories almost always move quickly, and the pace of the plot is at least as important as characterization, setting and other elements of a creative work.”^২

তবে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির বিপ্রতীপে এই ‘নেশা’র অবস্থান। তাই ‘অ্যাডভেঞ্চার’ একধরনের রোম্যান্টিকতার সূচক বা চিহ্নও বটে।

পাশ্চাত্যের কিশোর-সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাত ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। Johann David Wyss-এর ‘The Swiss Family Robinson’ (১৮১২), Frederick Marryat-এর ‘The Children of the New Forest’ (১৮৪৭), Harriet Martineau-এর ‘The Peasant and the Prince’ (১৮৫৬) হল তার উদাহরণ। ভিক্টোরিয়ান যুগে এই সংক্রপটির উদ্ভব ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে যুক্ত হয় ঐতিহাসিক মাত্রা। আধুনিক যুগে বিশ শতকে বহু বিতর্কিত সাম্প্রতিক বিষয়ও অ্যাডভেঞ্চার উপাদান হয়ে উঠেছে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস’ বইয়ের ‘শাদা মানুষের দায় ও কালো মানুষের দায়িত্ব’ এই অধ্যায়ে উনিশ শতকে ইউরোপে কীভাবে এবং কেন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাত হয়েছিল বা হওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল, তার একটি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি গড়ে ওঠা সম্পর্কে কয়েকটি সূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমালোচকের কাছে। সূত্রগুলি নিম্নরূপ –

- ১) বাস্তববাদী চিন্তার বিপ্রতীপে শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক চিন্তাচেতনা কেলাসিত রূপ ধারণ করেছিল অ্যাডভেঞ্চারধর্মী কাহিনিগুলিতে।
- ২) প্রচ্ছন্ন ভাবে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে তৈরি হয় শাসক ও শাসিতের; সভ্য ও অসভ্যের; সংস্কৃত-চিন্তক ও অসংস্কৃত-চিন্তকের ভাষ্য।
- ৩) সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের বৃত্তান্ত এবং উপনিবেশের প্রতি উপনিবেশকারীদের শ্যেনদৃষ্টি।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির জন্ম ইংরেজি অ্যাডভেঞ্চারের প্রেরণাতে হলেও তার একটা নিজস্ব ধরন ছিল। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্ভবেরও একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি ১৮২৩ সালে রামমোহনের লেখা একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন – “...the natives of Bengal wanting vigour

of body and adverse to active exertion...” অর্থাৎ, বাঙালির ‘দুর্বল শরীর’ তার অধীনতার এক চিহ্নবিশেষ। প্রায় একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের ‘বিদ্যাসাগরচরিত’ প্রবন্ধে –

“...নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।”^৩

কিন্তু এই শীর্ণতা স্বাস্থ্যদৌর্বল্যকে তোয়াক্কা না করে সেই অপবাদ ঘোচাতে বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে জন্ম নিয়েছিল দুই শ্রেণির চরিত্র – ১) যারা অভিভাবকদের তাড়নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বাড়ি ছেড়ে পালায়; (যেমন – শিবরাম চক্রবর্তীর ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’র কাঞ্চন বা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘ভোম্বোল সর্দার’-এর ভোম্বোল) আর ২) যাদের “ধরাবাঁধা গতির জীবন ক্ষুদ্র করে তোলে, অজানার উজানে ভেসে থাকার ঝুঁকি নিতে তারা যেনো মুহূর্তে প্রস্তুত।” বিভূতিভূষণের ‘চাঁদের পাহাড়’-এর শঙ্কর বা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বিমল বা কুমারকে তিনি এই শ্রেণির বলে উল্লেখ করেছেন।^৪ বোঝা যায়, শারীরিক শীর্ণতাকে উপেক্ষা করে নতুন ধরনের এক চরিত্রশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে বাঙালি তরুণ। আর, এভাবেই নিজস্ব ঘরানায় আত্মপ্রকাশ করে বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। ‘চাঁদের পাহাড়’-এ জানা যায়, -

“(শঙ্করের) মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর দূর দেশে – শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। ...যদিও একথা ভেবে দেখেনি অন্যদেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালির ছেলের পক্ষে তা ঘটা একরকম অসম্ভব। তারা তৈরি হয়েছে কেরানী, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হওয়ার জন্য। অজ্ঞাত অঞ্চলের অজ্ঞাত পথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই নিরাশা।”^৫

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘সোনার পাহাড়ের যাত্রী’ উপন্যাসের নায়ক বিমলের বক্তব্য ছিল-

“আমাদের রক্তে, আমাদের শিরায় শিরায়, আমাদের হৃদয়ের পরতে পরতে আছে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ, ঘরমুখো বাঙালির ঘরে জন্মেও আমরা হতে চাই বিশ্বমানবের আত্মীয়, আমরা ধন-মান-খ্যাতি কিছু প্রার্থনা করি না, আমরা চাই শুধু ঘটনার আবর্তে ঝাঁপ দিতে, উত্তেজনার পর উত্তেজনা ভোগ করতে, নব নব দৃশ্য আর সৌন্দর্যের মধ্যে তলিয়ে যেতে। সক্রিয় জীবন চাই, গতির বন্যা চাই। বিপদের মহোৎসব চাই।”^৬

এই জাতীয় উক্তি প্রমাণ করতে চায় যে, বাঙালির চিরকালীন শান্তিপ্ৰিয়, ‘ভেতো’ স্বভাবের বদনাম ঘুচিয়ে দিতে এবং ‘পরিবার’ নামক ‘পিছুটান’ কাটিয়ে অনির্দেশ্যতার প্রতি এগিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই বাঙলা সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাত হয়।

‘অ্যাডভেঞ্চার’ মূলত একটি সরণের কাহিনি। স্থানান্তরের কাহিনি। স্থানিক পরিচিতির অতিক্রমণ; একই সঙ্গে তা কালিক-ও। মানুষের স্মৃতির যে পরিধি, বা স্মৃতিলোক থেকে মানসিক যে সরণ, তাকে ‘অ্যাডভেঞ্চার’ বলা যায় কি না, তা বেশ তর্কসাপেক্ষ। উনিশ শতকের নবজাগরিত বাংলা একসঙ্গে অনেক নতুন বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, নতুন পাঠক্রম, ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য বাঙালির নতুন চেতনা তৈরি করতে শুরু করেছিল। এই প্রথম উপনিবেশের বাঙালি বুঝতে পারলো, বাইরের বিস্তৃত জগৎ জ্ঞানের দ্বারাই অধিগম্য। নিজেদের তারা চিহ্নিত করতে শুরু করলো ‘অপর’-এর সাপেক্ষে। এই ‘অপর’ হল অন্যান্য দেশের বাসিন্দা। ভারতীয় তথা বাঙালি সামগ্রিক ভূ-রাজনৈতিক প্রতিবেশে চিনে নিতে চাইছিল নিজের অস্তিত্বকে – ‘অপর’ (other) ও ‘আমি’ (self) – এই দুই ধারণার পারস্পরিক অবস্থান স্পষ্ট করে বুঝে নিতে এই সময়ের বাঙালি ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে উঠছিল। এরই মধ্যে বাংলায় ১৮৫৪ সালে চালু হয় ডাকব্যবস্থা, লর্ড ডালহৌসির সৌজন্যে এবং সেই বছরই, প্রথম ট্রেন চলতে শুরু করে বাংলাতে। এই প্রযুক্তিগত বিস্তার অদেখা জগতের প্রতি বাঙালির আকর্ষণ ক্রমশ বাড়িয়েই তুলছিল। তাই মানুষ এ-ও মনে করতে শুরু করে যে, জ্ঞানের জগতে যা আহরণ করা গিয়েছে, বাস্তবে তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব কি না। মূলত এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসই মানুষের তথা বাঙালির মনে প্রাথমিক পর্বে ভ্রমণের ঈঙ্গা ও পরবর্তীতে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তৈরি করেছিল – বেশ অনেক সময় পরেই তা কাহিনি হিসেবে রূপ লাভ করেছিল।

বাংলা অ্যাডভেঞ্চার আখ্যানে উক্ত প্রবণতা ছাড়াও আরও যা দেখা যায়, তা হল মধ্যবিত্ত বাঙালির দ্বিধাদীর্ণ চরিত্র। সম্মান-অসম্মানের দ্বন্দ্ব ইংরেজ ও বাঙালি ভদ্রলোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে, যার প্রভাব পড়ে এধরনের গল্পে। ছোটদের জন্য লিখিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে দেখা যায় ‘ভারতবর্ষের শাস্ত্র মহিমা, অক্ষয় কীর্তির বা আধ্যাত্মিক বৈভবের সাড়ম্বর প্রকাশ।’^১ কখনো বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ছাপও মেলে সেই ধরনের লেখায়।

বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির চরিত্র বিচার করতে গিয়ে দেখা যায় সেখানে মহিলাদের কোনো ভূমিকাই নেই। এর মূল কারণ অবশ্যই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। ‘পরিবার’ যেখানে মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালি তরুণদের কাছেই ছিল পিছুটানের সূচক, সেখানে মহিলাকেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লেখা খুব একটা সহজ ছিল না। ‘পরিবার’ ছিল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্টকৃত অবস্থান-ক্ষেত্র। এছাড়া, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলি মহিলাবর্জিত লেখা হওয়ার কারণ হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা।

“ঔপনিবেশিক সাহিত্যিকদের চোখে নারী স্বভাবতই ‘অবলা’, বীর পুরুষদের বিপরীত-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে সে। ‘বুদ্ধি’ বা ‘সাহস’ না থাক, নারী কিন্তু পুরুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিতে পারে, কর্তব্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারে। বিভিন্ন লেখায় নানা ছলে-কৌশলে জানানো হয় যে নারী নরকের দ্বার, সুতরাং তার প্রতি এক সহজাত অবিশ্বাস ও মজ্জাগত বিদ্বেষ থাকাকাটা পুরুষের পক্ষে আদৌ নিন্দনীয় নয়। ফলে পুরুষের বশ্যতা যে নারী নিঃশব্দে মেনে নেয় একমাত্র সে-ই গ্রহণযোগ্য। কিশোরদের জন্য রচিত ঔপনিবেশিক সাহিত্যে থাকে শৌর্য-বীর্যের পাঠ; সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয় যে পুরুষকেন্দ্রিক বীক্ষণই একমাত্র বীক্ষণ, পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। ... ঔপনিবেশিক পৌরুষের প্রধান লক্ষ্য তিনটি – দেশীয় শ্রমিক শ্রেণী, উপনিবেশের প্রজা এবং নারী। ঐ তিন ধরনের নিম্নবর্গীয়দের ঔপনিবেশিক বয়ানের (ডিসকোর্স) সীমানার বাইরে ঠেলে দেওয়াটা একান্ত দরকার ছিল, দরকার ছিল তাদের তিনটি ভেদাভেদশূন্য এককে (Category) পরিণত করা, সম্পূর্ণ সমীভবন ঘটিয়ে ফেলা।”^২

শিবাজীর এই বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে মেয়েদের কোনো ভূমিক আদপেও থাকা সম্ভব নয়। তবে বিশ শতক থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। মেয়েরাও নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে দেখার চেষ্টা করে। নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করার জন্য বেরিয়ে যেতে শুরু করে চেনা ছকের বাইরে।

অ্যাডভেঞ্চার যেহেতু ‘স্থানান্তরণ’ সম্পৃক্ত বিষয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তা বাইরের জগতের সঙ্গেই অগ্নিস্থ, সেহেতু মেয়েদের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের প্রথম থেকেই বিপ্রতীপতার সম্পর্ক। উনিশ শতকে তো ‘অন্দর’ মহল ও ‘বাহির’ মহল – এই দুই এলাকা নির্দিষ্টই করা থাকতো যথাক্রমে নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্র হিসেবে। প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষাজগতে এবং কর্মজগতেও বাঙালি মেয়েদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে অনেকটাই দেরিতে, ধীর গতিতে। তাই সাধ করে, শখ করে বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়ার দুঃসাহস বাঙালি মেয়েদের হয়নি। তবে, আগে বলা হয়েছে যে, ধীরে ধীরে এই চেনা ছবিরও পরিবর্তন হয়েছিল। এই পরিবর্তনের পর্বান্তর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে হয়েছিল, তা এবারে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

উনিশ শতকে মহিলাদের সামগ্রিক অবস্থান নির্দেশ করতে হলে সর্বাত্মে দেখা দরকার ‘পরিবার’ ধারণাটি। উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের প্রাথমিক সামাজিক একককে ‘পরিবার’ বলা হয়।^৩ ‘পরিবার’ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ ‘পরিভারা’ থেকে – যার অর্থ হল নির্ভরশীল।^৪ বস্তুত, জন্মগত তথা পরিবারগত সম্পর্ক দ্বারাই রচিত হয় মানুষজনের প্রাথমিক পরিচয়পত্র। সুধীর কঙ্কর ও ক্যাথরিনা কঙ্কর ভারতীয়ত্ব প্রসঙ্গে মনে করেছেন যে, ভারতীয়দের মনে সমাজতন্ত্র বা ধনতন্ত্র বলে কিছু নেই, আছে শুধু পরিবারতন্ত্র –

“If there is one ‘ism’ that governs Indian Society and its institution, it is familism.”^৫

উনিশ শতক থেকেই এই পরিবারের চেতনা ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান।

প্রদীপ বসু তাঁর ‘পরিবারের ধর্ম’ শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন যে, উনিশ শতক থেকে শিশু পালন, ধর্ম, পালনীয় কর্তব্য, আচরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, রক্ষণ, দাম্পত্য সম্পর্ক – ইত্যাদি সমস্ত উপাদানকে সংগঠিত করে নির্দিষ্ট সম্পর্ক ও নিয়মের ভিত্তিতে এক পূর্ণাঙ্গ রূপ তৈরি হয় পরিবারের – যাকে তিনি ‘ডিসকোর্স’ বলতে আগ্রহী। তিনি উনিশ শতকের ‘পরিবার’কে উল্লেখ করেছেন – ‘মানসিক গুণাবলি এবং চেতনা বিকাশের এক আদর্শ স্থল’ হিসেবে।^{১২} আমরা জানি, উনিশ শতকের বহু চিন্তাবিদ এই নতুন ‘পরিবার’ ধারণা বিস্তারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রচুর প্রবন্ধ, এমনকি উপন্যাসেও সেই বিষয়ে লেখালেখি হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও আদর্শ পরিবার নির্মাণ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে নারীদের পাঠ দেওয়া শুরু হয়েছিল। শিবানাথ শাস্ত্রী ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বামাবোধিনী পত্রিকাতেও নারী ও পরিবার সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এইভাবে, সেই সময় থেকে ‘পরিবার’ নামক একটি নতুন ধারণা তথা ‘ডিসকোর্স’ তৈরি হতে দেখা যায়।

প্রাথমিক পর্বে ‘পরিবার’ তাই উনিশ শতকীয় শিক্ষিত বাঙালি পুরুষের কাছে হয়ে উঠেছিল এক স্বাধীনক্ষেত্র, নিভৃত আশ্রয়। তবে, এই ইতিবাচক ধারণার পাশাপাশি ‘পরিবার’ যেহেতু অন্তঃপুর বা অন্দরমহলের নামান্তর, সেহেতু এখানে বহির্গমনের অধিকারী বা বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সমর্থ পুরুষের সঙ্গে নারীদের সামাজিক তথা পারিবারিক অবস্থানগত এক বৈষম্যও চোখে পড়ে। উপনিবেশবাদের জাঁতাকলে পিষ্ট পুরুষ পরিবারের অভ্যন্তরে যখনই নিজেদের সন্মুখ বা সকল ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতো, তখনই, অজান্তেই অন্তঃপুরে বন্দী বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন নারী ‘অপর’ বলে চিহ্নিত হত। সখ্য বা সমানাধিকারের পরিবর্তে শাসক-শাসিতের সম্পর্কেও অনেক সময়েই বিন্যস্ত হত এই ডিসকোর্স। বিষয়টি আরো একটু বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

উনিশ শতকে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি মহিলাদের একমাত্র বিচরণক্ষেত্র ছিল অন্তঃপুর। ‘অবরোধ প্রথা’ ধীরে ধীরে কমে এলেও মেয়েরা সাধারণত ঘরের বাইরে বের হত না। তাদের অস্তিত্বের প্রায় পুরোটাই জুড়ে ছিল ‘ঘর গৃহস্থালি’। সামাজিক রীতি অনুসারে উনিশ শতকের মেয়েদের এত অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত যে, ‘সংসার’ বলতে তাদের বিবাহোত্তর জীবন বা শ্বশুরবাড়িকেই বোঝাত এবং পিতৃগৃহকে তাদের ‘প্রকৃত জীবনের প্রস্তুতি পর্ব’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হত।^{১৩} কন্যার ভূমিকা পালনের পর একটি বালিকা খুব দ্রুত ‘জায়া’ ও ‘জননী’ এই দুই বৃহত্তর পরিচিতি লাভ করতো এবং বাংলার পারিবারিক গঠন বৈশিষ্ট্যে তাকে আরও বহুস্তরীয় সম্পর্কের আবেষ্টনীর মধ্যে সম্পর্কিত হত। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যেত পুরুষ শাসিত সমাজ এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠা শাশুড়ি বা শাশুড়ি-প্রতিম কোনো রাশভারী মহিলা, যিনি বা যাঁরা সংসারের কত্রী রূপে স্বীকৃত, সেই ‘গৃহিণী’-শাসিত সংসারে এই মেয়েরা কোণঠাসা, প্রান্তিক। পারিবারিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মেয়েরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কথা বলেছিল বলে বারবার নারীকণ্ঠে শোনা যেত পুরুষের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। নারীর মনেও প্রবেশ করানো হত পিতৃতান্ত্রিক বোধবুদ্ধি ও চাহিদা। এই সূত্রেই বলা যেতে পারে, - উনিশ শতকের এই মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের উপর ‘গৃহিণীত্ব’ ছিল এক “বাধ্যতামূলক আরোপিত ঘটনা।”^{১৪}

উক্ত সময়পর্বে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’য় ‘নারী ও পরিবার’ সম্পর্কে যে নিয়মিত লেখা বেরোত, সেখানকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ছিল ‘গৃহিণীর কর্তব্য’, ‘গার্হস্থ্যদর্পণ’ ইত্যাদি। কীভাবে মেয়েরা আদর্শ গৃহিণী হয়ে উঠবে, এ ধরনের লেখাতে তার পাঠ দেওয়া হত -

“গৃহের সমুদায় কার্যের অধ্যক্ষতা করা গৃহিণীর প্রথম কর্তব্য। ... সমস্ত পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং কল্যাণ তাহার উপর নির্ভর করছে জানবেন।”^{১৫}

গার্হস্থ্য দর্পণে স্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়, -

“সাংসারিক সুখ তাহারই হাতে, তিনি কার্যে পটু ও আচারে লক্ষ্মী হইলে সংসারের সুখ ঐহিকের পরম সুখ বলিয়া বোধ হয়।”^{১৬}

‘মহিলা’ পত্রিকার ১৩১০, মাঘ সংখ্যায় লেখা হল মেয়েরা ঘরের কাজের জন্যই উপযুক্ত; কারণ, তারা ‘গৃহলক্ষ্মী’। শিক্ষণীয় বিষয়ের সীমানা চিহ্নিত করে এবং মেয়েদের কর্তব্যের বিষয়ে বারবার সচেতন করে তাদের পারিবারিক সুনির্দিষ্ট ঘেরাটোপে আবদ্ধ করা হচ্ছিল। মেয়েদের অর্থ উপার্জনের ভাবনা তখনও অন্তরালে, যদিও দুঃস্থ মেয়েরা ঘরে বসে অর্থ উপার্জনের

অনুমতি পেয়েছিল। কৃষ্ণভামিনী দাসী ‘স্ত্রী লোকের কাজ’ প্রবন্ধে ঘরে বসে করতে পারা যায় এমন বিভিন্ন কাজের তালিকা দিয়েছিলেন। মোটের উপর স্ত্রীলোকের মূল কাজগুলিকে শ্রেণি বিন্যস্ত করা হয়েছিল এইভাবে –

- ১) গৃহ ও গৃহসামগ্রীর পরিষ্করণ ও সুচারু সজ্জা
- ২) পরিমিত ব্যয়ে গৃহস্থালির সঞ্চালনা
- ৩) রন্ধন ও পরিবেশন
- ৪) সূচিকর্ম
- ৫) পরিজনদের যত্ন
- ৬) সন্তানপালন^{১৭}

এর সঙ্গে শিশুকাল থেকেই নারী মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত সতীত্বের ধারণা, পতিসেবার পুণ্য। উক্ত সমস্ত ধারণার সঙ্গে মেয়েরা ‘ধর্মভীরুতা’, ‘সহিষ্ণুতা’, ‘ভক্তি প্রবণতা’, ‘লজ্জাশীলতা’, ‘বিশ্বস্ততা’ ইত্যাদি গুণগুলি নিজেদের চরিত্রের অঙ্গ বলে মনে করে নিজেদের একটি জগৎ নিজেদের মতো করে গড়ে তুলেছিল; সমাজ-পরিবার ও আত্ম-নির্মিত সেই জগৎ সীমায়িত ছিল চার দেওয়ালের মধ্যেই, যাকে বলা হয় ‘ঘর গেরস্থালি’।

এতক্ষণ ধরে যে অশুঃপুরচারিনীদের কথা বলা হল, তারা ‘ভদ্রমহিলা’, যাদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল ‘ভদ্রলোক’দের সাপেক্ষে। আঠারো-উনিশ শতকে সমাজে নিম্নবর্গ তথা ‘ছোটলোক’ – এই শ্রেণির বিপ্রতীপে রুচিশীল, শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক একদল লোক নিজেদের শ্রেণিসত্তা নির্মাণে সচেতন হয়ে উঠেছিল – ঐতিহাসিক বিচারে এরাই ‘ভদ্রলোক’। উনিশ শতক থেকেই ভারতীয় তথা বাঙালি নারী হয়ে ওঠে ‘The Angel in the House’ – আদর্শ পুরুষ গড়ে তোলা হয়ে ওঠে তার কর্তব্য, সমাজ নির্মাণে তার না-ই বা থাকলো কোনো ভূমিকা – তার জন্য বরাদ্দ হয় ‘Home’ বা গৃহকোণ – ঐতিহ্য, পরম্পরা, আত্মমর্যাদা যেখানে লুকিয়ে থাকে। এই পবিত্রতা যেহেতু বঙ্গ রমণীই রক্ষা করে, তাই সে বিদেশি কলুষতা মুক্ত। অন্দরমহলে নারীর এই ভূমিকা কেন্দ্র করেই বিদেশী জাতির থেকে বাঙালি পৃথক পরিচিতি নির্মাণে সচেষ্ট হয়।^{১৮} যেহেতু ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার শিকার, বহির্জগতে পরাজিত বাঙালি ভদ্রলোক, গার্হস্থ্য জীবনে ‘Ruler’, ‘Administrator’, ‘Legislator’, ‘Chief Justice’-এর ভূমিকা পালনে ইচ্ছুক ছিলেন, সেহেতু ‘ভদ্রমহিলা’রা থাকতেন সম্পূর্ণ নিবেদিত। এইভাবে ‘অন্দরমহল’ নির্মাণ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গঠিত জাতীয়তাবাদী পুরুষতান্ত্রিক ধারণা, যেখানে ভারতীয় আদর্শ রমণীর ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছিল।^{১৯} এইভাবেই দেখা যায়, -

“The modern distinction between public and private spheres has been employed in such a way that women are constructed as occupying only the private realm... while men are assumed to span both, their lives having both a public, political identity and private personal one. The public private split becomes a male-female distinction and a women’s existence within the private realm is justified by her nature.”^{২০}

মেয়েদের কেন্দ্র করে অভিযান কাহিনি গড়ে না ওঠার ক্ষেত্রে এ ধরনের সামাজিক কারণ অবশ্যই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নারীর অস্তিত্ব, অধিকারবোধ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নানা বিতর্কের সৃষ্টি করলেও চোখে পড়ার মতো কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভারতী রায়ে মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪০-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬-এর দাঙ্গা, সামগ্রিকভাবে চল্লিশের দশক থেকেই ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নানাবিধ পরিবর্তন লক্ষ করা যেতে থাকে। ভারতের নারীসমাজেও নতুন ভাবধারা উন্মোচিত হয়। এর তিনটি দিক –

- ১) শিক্ষার প্রতি আগ্রহ
- ২) পারিবারিক জীবন রীতিতে পরিবর্তন
- ৩) বহির্বাটীর যাত্রাপথে অবতরণ^{২১}

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, পারিবারিক গঠনের বদল, বিবাহের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, উদ্বাস্তু সংকট, বিশ্বযুদ্ধ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সাংবিধানিক অধিকার — এই সমস্ত বিষয়ের প্রভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রমহিলাদের কাজের ধরন ও ক্ষেত্র ক্রমশ পরিবর্তিত হতে শুরু করে। প্রাথমিক ভাবে বাড়ির বাইরে শুধুমাত্র শিক্ষাদানে যুক্ত থেকে ধীরে ধীরে চিকিৎসা, ফোটোগ্রাফি, টাইপ রাইটিং, পরিদর্শকের কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলার অগ্রসর হচ্ছেন। প্রয়োজনের তাগিদে এই যে মহিলাদের বহির্মুখী হতে দেখা গেল, আর ফিরলেন না তাঁরা। এবার শখ, ইচ্ছে সাধ ইত্যাদি পূরণ করতেও তাঁরা বেরোলেন সমাজনির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে — সেটাই মেয়েদের অ্যাডভেঞ্চার।

‘কঙ্কাবতী’/ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-এর লেখা ‘কঙ্কাবতী’ আমাদের বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করার জন্য সর্বপ্রথমে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। ১৮৪৭ সালের ২ জুলাই ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম। হুগলির চুঁচুড়া ও ভদ্রেপুরে প্রথাগত শিক্ষা লাভ করলেও মূলত তিনি স্বশিক্ষিত। শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও মধ্য বয়স থেকেই তিনি ভারতীয় যাদুঘরের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছিলেন। বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় সমান পারদর্শী এই ব্যক্তি ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই লিখেছেন। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারি হওয়ার সুবাদে পরাধীনতার গ্লানি, উপনিবেশবাদের যন্ত্রণা — এসবও খুব কাছ থেকেই অনুভব করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখাতেই তাই রসিকতার মোড়কে ব্যঙ্গের শাণিত আঘাত লক্ষ করা যায়। তিনি পাঠকমানে কালজয়ী স্থান অধিকার করে আছেন তাঁর ‘ডমরুচরিত’-এর জন্য, যা তাঁর মৃত্যুর (১৯১৯) পর ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্যের সময় ১৮৯২, নাম ‘কঙ্কাবতী’।

‘কঙ্কাবতী’ বাংলা সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ এর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন ‘সাধনা’ পত্রিকার ফাল্গুন, ১২৯৯ সংখ্যায়। সেখানে তিনি এই উপন্যাসের রূপকথা-ধর্ম, শিশুমানসকে স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করতে পারার অসীম ক্ষমতা বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। অন্যত্রও দেখি, ‘কঙ্কাবতী’র পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা ঔপনিবেশিক সময়, উপনিবেশের চাপ, শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তার আলোকপাত করা হয়েছে। এই সমালোচনার ধারায় নারায়ণ সান্যাল প্রথম একটু অন্যরকম কথা বললেন তাঁর ‘কিশোরী সমগ্র’ বইয়ের গোড়ায়। ত্রৈলোক্যনাথকে তিনি চিহ্নিত করলেন ‘এক বিশেষ জাতের কিশোরী সাহিত্যিক’ হিসেবে; কারণ, তাঁর মতে, -

“কঙ্কাবতীই কিশোরী সাহিত্যের প্রথম নায়িকা।”^{২২}

কঙ্কাবতী ‘কল্পনাবিলাসিনী, স্বপনচারিণী’। এই উপন্যাস তাই তারই মনোজগতের রূপায়ণ। এই সূত্র ধরেই আমরা ‘কঙ্কাবতী’কে একটু অন্যভাবে পড়ার চেষ্টা করব।

কে এই কঙ্কাবতী? ব্রিটিশ শাসিত ভারতের একটি অখ্যাত গ্রামের (কুসুমঘাটা) নিয়মনিষ্ঠ হিন্দু বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের তিন কন্যাসন্তানের সর্বকনিষ্ঠা। উনিশ শতকের যে সমাজ কাঠামো, সেখানে অর্থগুণ তনু রায়ের (কঙ্কাবতীর বাবা) কাছে কন্যাসন্তান পণ্য বিশেষ। তাই যেন তেন প্রকারেণ কঙ্কাবতীকে পাত্রস্থ করতে উৎসুক তিনি এবং এক বৃদ্ধ পাত্র মনোনীতও করে ফেলেন। তনু রায়ের স্ত্রী যদিও সহমত নন — কারণ, তাঁর বড় দুই মেয়ে একই কারণে অকাল বিধবা হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। উপন্যাসটির কালচিহ্ন এক্ষেত্রে স্পষ্ট।

উপন্যাসের নায়ক তনু রায়ের প্রতিবেশী খেতু। শিক্ষিত, বিচক্ষণ খেতু কঙ্কাবতীকে শিক্ষিত করে তোলে (যদিও সমাজ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী), কঙ্কাবতীর খেতুকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হলেও তার দারিদ্র্য বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কঙ্কাবতীর বিয়ে স্থির হয় বৃদ্ধ পাত্রে এবং কঙ্কাবতী গৃহত্যাগ করে। শুরু হয় ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যের নিরিখে তো বটেই, সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যেও এইটাই প্রথম কোনো মেয়ের অভিযাত্রার গল্প। এখানে রয়েছে স্থানিক সরণ — মনের অভিমান মেটাতে সে মাঝ নদীতে নৌকায় চড়ে বসে — দিদির ডাকে সাড়া দিয়ে বলে

“শুনিয়াছি আছে নাকি জলের ভিতর/ শান্তিময় সুখময় সুশীতল ঘর/ সেইখানে যাই দিদি পূজি তোমার পা/ এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হথু যা।”^{২০}

ভাই কঙ্কাবতীকে কূলে কলঙ্ক লেপন থেকে বিরত করতে চাইলেও সে বলে, -

“...জ্বলিছে আগুন দেহে নিবাইতে নারি/ যাও দাদা ঘরে যাও হও তুমি রাজা”; মায়ের করুণ আকৃতিকেও সে বুঝিয়ে বলে, “বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে/ তুষের আগুন সদা জ্বলিছে দেহেতে/ এই আগুন নিবাইতে যাইতেছি মা।”^{২১}

বাবা টাকা-পয়সা-গয়নার প্রলোভন দেখিয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইলে উত্তর দেয়— “টাকা কড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ/ আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন/ এ দারুণ যাতনা পিতা আর সহে না/ এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা”— এই উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় উনিশ শতকে মেয়েদের স্বাভাবিক দিন যাপনের অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়ায় এই ছক ভাঙার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় কঙ্কাবতী। বাংলার প্রথম বালিকার অ্যাডভেঞ্চার তাই দায়ে পড়ে, পারিবারিক-সামাজিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে, শখ পূরণার্থে নয়।

জলের ভেতরে ডুবে গিয়ে কঙ্কাবতী পৌঁছয় মৎস্যরাজ্যে — মাছেরা তাকে রানী করতে চায়। রাজবেশ পরানোর জন্য ‘পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম’ করে বুড়ো দরজির কাছে পৌঁছতে হয়। সঙ্গী কাঁকড়া ও কচ্ছপ। তারপর খলিফার তৈরি রাজবন্দে সুসজ্জিতা কঙ্কাবতীকে ঝিনুকের মাঝে ‘মোতিমহল’-এ থাকতে দেওয়া হয়। কঙ্কাবতীর রূপ ও গুণে মুগ্ধ সকলে তাকে রানী হিসেবে পেয়ে ধন্য ধন্য করে। লক্ষণীয়, বাস্তব সমাজ তার যে মূল্য দিতে পারেনি, বাস্তব থেকে রোমান্টিক জগতে সরণের ফলে তা সে লাভ করে।

কাহিনি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাবতীর স্থানান্তর ঘটে। গোয়ালিনীর ঘরে তার ঘটনাচক্রে আগমন ঘটে এবং সেখানে খেতুর মায়ের মৃত্যুসংবাদ তাকে উন্মাদিনী করে তোলে — সে শ্মশানমুখী হয়। সেখানে খেতুর সঙ্গে তার আবার দেখা হয়, খেতু স্থান পরিত্যাগ করে, কঙ্কাবতী ফের নিজগৃহে ফিরে আসে এবং সেখানে ব্যাহুরূপী খেতু তাকে বিবাহ করে এক অজ্ঞাত ঠিকানায় নিয়ে আসে। লক্ষ করব, কঙ্কাবতীর চলন অব্যাহত।

খেতু তার ব্যাহুরূপ ধারণের আদ্যোপান্ত বর্ণনাকালে নাকেশ্বরী প্রেতিনীর উল্লেখ করে এবং কঙ্কাবতীকে সেই স্থান ত্যাগ করতে বললে কঙ্কাবতী উত্তর দেয় —

“কঙ্কাবতী নরকের কীট নয়। নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিলে ভাল, না পারি, তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। যদি তোমার মৃত্যু, তো আমারও মৃত্যু। কঙ্কাবতী মরিতে ভয় করে না। তোমাকে ছাড়িয়া কঙ্কাবতী এ পৃথিবীতে থাকিতেও চায় না।”^{২২}

অভিযাত্রী কঙ্কাবতীর কঠেও ধ্বনিত হয় মনুসংহিতার নিদান —

“পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।/ সা ভর্তৃলোকানাপ্লোতি সন্ডিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে” অর্থাৎ, “কায়মনোবাক্যে যে নারী পতিকে লঙ্ঘন করেন না, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন এবং সজ্জন কর্তৃক সাধ্বী বলে কথিত হন।”^{২৩}

অ্যাডভেঞ্চারধর্মী গল্পে সংকট ও সংকটমোচনের যে পুনরাবৃত্তি ছক থাকে, এইখান থেকেই যেন তা পুরোদস্তুর বোঝা যায়। একটি মেয়ে এগিয়ে আসে সংকটমুক্তির ক্ষেত্রে, যদিও তার চালিকাশক্তি উনিশ শতকীয় পতিসেবার আদর্শ, তবুও এই ইচ্ছে প্রশংসার্হ।

খেতুকে নিয়ে কঙ্কাবতী-নাকেশ্বরীর যুদ্ধের বেশ মজাদার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। নাকেশ্বরীর প্রবল নিঃশ্বাসের দাপটে কঙ্কাবতী একবার দরজার কাছে পড়ে যায়, তবু হাল ছাড়ে না। খেতুকে উদ্ধার করতে সে বদ্ধপরিকর। তবে নাকেশ্বরীর দ্বিতীয় নিঃশ্বাসে সে হার স্বীকার করে ও “কঙ্কাবতী একেবারে পর্বতের বাহিরের বনের মাঝখানে”^{২৪} গিয়ে পড়ে। আরও একবার স্থান পরিবর্তন ঘটে তার। অচেনা পরিসরে একের পর এক অজানা চরিত্রের মুখোমুখি হয় সে। ব্যাঙ (মি. গম্বীশ)-এর পরামর্শে সে এগোতে থাকে, মশার সঙ্গে ‘পচাকাল’ পাতিয়ে সে অনুরোধ করে —

“পতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আমি লোকালয় যাইতেছি। সেখান হইতে ভাল চিকিৎসক আনিব, আমার স্বামীকে দেখাইব। তাই আমি বিলম্ব করিতে পারি না। পুনরায় আমি এই রাত্রিতেই পথ চলিব। ...তোমরা আমাকে একটু যদি পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।”^{২৮}

কঙ্কাবতীর পথ চলা ফুরায় না। খর্বুর, ব্যাঙ, মশা সকলের সহায়তায় কঙ্কাবতী এবার চলে খোক্কোসের বাচ্চা ধরতে। কঙ্কাবতী আকাশে উঠতেও ভয় পায় না। বীরদর্পে ঘোষণা করে –

“পতিপরায়ণা সতীর পরাক্রম আজ আকাশের লোককে দেখাইব”^{২৯}

এবং যাত্রার প্রারম্ভে খেতুর পদধূলি নিতেও সে ভোলে না। অর্থাৎ, অ্যাডভেঞ্চারের মাদকতা বা ব্যক্তিগত ভাবে অভিযাত্রার সাফল্যে কঙ্কাবতী মগ্নিত নয়, তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ঔপনিবেশিক যুগের নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিন্যাস। এই অভিযানের মূল চালিকাশক্তিও তাই।

আকাশ পৌঁছে খোক্কোস শাবকের পিঠে চড়ে কঙ্কাবতী নক্ষত্রদের বৌকে অনুরোধ করে চুনকামে লেপে দেওয়া আকাশের মূল পথটি বলে দিতে। আকাশের মূল অংশে প্রবেশ করে খোক্কোসকে মেঘের ডালে বেঁধে পায়ে হেঁটে সে চাঁদের কাছে পৌঁছায়। এরপর এক দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চাঁদ, দুর্দান্ত সিপাহী, চাঁদনী ও চাঁদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কঙ্কাবতীর চলতে থাকে – কঙ্কাবতী পূর্ববর্তী পরামর্শ অনুযায়ী চাঁদের শিকড়ের অংশবিশেষ টেঁছে এনে খেতুকে খাওয়াতে সমর্থ হলেও খেতুর মৃত্যু হয়। এর পরবর্তী অংশে লেখক অত্যন্ত বিশদে কঙ্কাবতীর সহমরণের ইচ্ছে এবং আয়োজনের বর্ণনা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কঙ্কাবতী ‘সতী’ হয় এবং “অতি সুখ নিদ্রা। অতি শান্তিদায়িনী নিদ্রা” তে আচ্ছন্ন হয়।

উপন্যাসটির শেষ অংশে লেখক স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেন এতক্ষণ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা সবই কঙ্কাবতীর স্বপ্নচিত্র। কাহিনির সমাপ্তিতে কঙ্কাবতী জ্বরের ঘোর কাটিয়ে ওঠে ও সতাই খেতুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। সেখানে কোনো নতুনত্ব নেই। কঙ্কাবতীর আত্ম-আবিষ্কারও সাধিত হয় স্বপ্ন পর্বের অভিযানেই। ফ্রেডেরিয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী ‘স্বপ্ন’ আমাদের অবচেতনের আকাঙ্ক্ষার রূপ। তাই, একজন উনিশ শতকের মেয়ের পক্ষে বাস্তবে যা অসম্ভব ছিল, কিন্তু যা ছিল অভিপ্রেত, তা মেয়েটির স্বপ্নের দ্বারা পূরণ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়ী করে তোলা হয় তাকে, যদিও তার এই অভিযাত্রার মূলে ধ্বনিত হয় পতির প্রতি আনুগত্য, সেবা, ভক্তি – পতিপ্রেম থাকে অনুচ্চারিত। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বাস্তব থেকে রোমান্টিক জগতে, অপ্রাপ্তি থেকে সব পেয়েছির দেশে এই যে এক বালিকার অভিযান, তা প্রাপ্তবয়স্কদেরও চিন্তনের বিষয়। আর, এখানেই, সার্থকতা লাভ করে ‘কঙ্কাবতী’র বিকল্প পাঠ প্রচেষ্টা। কঙ্কাবতীকে লুই ক্যারলের ‘অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড’-এর অ্যালিসের সমগোত্রীয় মনে হলেও দুজনের সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ার কারণে দুটি রচনার ভরকেন্দ্র আলাদা হয়ে যায়।

বাংলা ভাষায় কিশোরদের উপযোগী অভিযান কাহিনিতে মেয়েদের আমরা এরপর থেকে খুঁজে পাব। শুধুমাত্র কল্পনার পরিসরে নয়, বাস্তবের মাটিতেও তারা এগিয়ে যাবে অনির্দেশ্যের পথে। উনিশ শতকে মেয়েদের ‘গৃহলক্ষ্মী’ নির্মাণ প্রকল্প ক্রমেই সাহিত্য শাখায় গুরুত্ব হারাবে। মেয়েদের সামাজিক লিঙ্গরূপের যে আর্কেটাইপ, তাকে প্রশ্ন করার প্রথম সাহস দেখিয়েছিল কঙ্কাবতী, তার অভিযাত্রার মাধ্যমে। ‘কঙ্কাবতী’ উপন্যাসের গুরুত্ব এই বিচারে বহুমুখী।

Reference:

1. Collins Cobuild, *Essential English Dictionary*, London, William Collins Sons & Co Ltd, 1988, p. 16
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Adventure_fiction on 3.01.2021, at 10.56 am
3. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, ‘সাদা মানুষের দায় ও কালো মানুষের দায়িত্ব’, ‘গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব: সমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা সাহিত্য’, কলকাতা, প্যাপিরাস, পৃ. ২৮০
4. তদেব, পৃ. ২৮১
5. তদেব, পৃ. ২৮১

৬. তদেব, পৃ. ২৮২
৭. তদেব, পৃ. ২৯২
৮. তদেব, পৃ. ২৭৭-৭৮
৯. সিনহা, সোহিনী, 'চাকুরীজীবী বাঙালিনী : প্রয়োজন ও পরম্পরা--উনিশ থেকে বিশ শতক', কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৬৬
১০. হোসেন, সেলিনা, 'গীতা ও নায়রিন', মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, 'জেভার বিশ্বকোষ', ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশন, ২০০৬, পৃ. ৭২৩
১১. Sudhir Kakar and Katharina Kakar, 'Portrait of a People', Penguin, 2007, p. 3
১২. বসু, প্রদীপ, 'পরিবারে ধর্ম', 'অনুষ্ঠাপ', সপ্তত্রিংশ বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭
১৩. চক্রবর্তী, সমুদ্র, 'অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা', কলকাতা, স্ত্রী, ১৯৯৫, পৃ. ১৬১
১৪. সিনহা, সোহিনী, 'চাকুরীজীবী বাঙালিনী : প্রয়োজন ও পরম্পরা উনিশ থেকে বিশ শতক', কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৬৯
১৫. রায়, ভারতী (সংকলন ও সম্পাদনা), 'নারী ও পরিবার', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', কলকাতা, আনন্দ, ২০০২, পৃ. ৩৬
১৬. তদেব, পৃ. ৬৯
১৭. চক্রবর্তী, সমুদ্র, 'অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা', কলকাতা, স্ত্রী, ১৯৯৫, পৃ. ১৭১
১৮. সিনহা, সোহিনী, 'চাকুরীজীবী বাঙালিনী: প্রয়োজন ও পরম্পরা উনিশ থেকে বিশ শতক', কলকাতা, অরুণা প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৯-১৬
১৯. Sarkar, Tanika, *Hindu Wife Hindu Nation: Community, Religion and Cultural Nationalism*, Permanent Black, 2001, p. 230
২০. Ellen Kenedy and Susan Mendus, *Women in Western Political Philosophy*, Palgrave Macmillan, 1987, p. 2
২১. Roy, Bharati, 'Women in Calcutta The Years of Change in Calcutta', Ed. by Sukanta Chaudhury, *The Living City- Vol.2*, Calcutta, Oxford, p. 34-41
২২. সান্যাল, নারায়ণ, 'বাঙলাভাষায় কিশোরী-সাহিত্য', 'কিশোরী সমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫-১৬
২৩. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, কঙ্কাবতী, পৃ. ৯৯
২৪. তদেব, পৃ. ১০০
২৫. তদেব, পৃ. ১৬৮
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, ভূমিকা অনুবাদ টীকা, 'মনুসংহিতা', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ-১৬৩-১৬৪
২৭. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, কঙ্কাবতী, পৃ. ১৯৬
২৮. তদেব, পৃ. ২১৬
২৯. তদেব, পৃ. ২৫৬